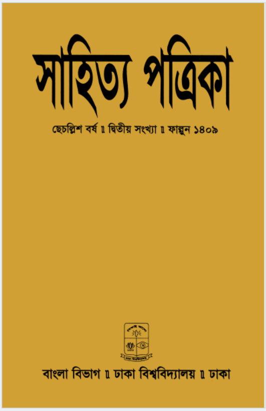

Vol. 46 | No. 2 | 2003

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

প্রমথ চৌধুরীর ‘আহুতি' গল্পগ্রন্থের বিষয়স্বাতন্ত্র্য

Volume	46
Issue	2
Year	2003
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আরজুমান আরা বেগম
Published online	February 1, 2003
DOI	10.62328/sp.v46i2.340
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v46i2.340
Pages	151-160
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

প্রমথ চৌধুরীর 'আহুতি' গল্পগ্রন্থের বিষয়স্বাতন্ত্র্য

Check for updates

আরজুমান আরা বেগম*

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে বাংলা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য একটি নাম প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)। রবীন্দ্র-যুগে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পের কোন মিল নেই। কেননা, তাঁর গল্পের গোত্র আলাদা। 'তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু— প্রেম ও রোমান্টিক প্রেমের ন্যাকামি, মর‍্যালিটি ও চারিত্রিক বিশুদ্ধতা, রাজনীতি ও সুবিধাবাদ, অ্যাডভেঞ্চার, ভূত আর রোমান্স।'[১] বিশুদ্ধ গল্পরস সৃষ্টিই তাঁর সাহিত্যের মুখ্য বিষয়— সামাজিক বা নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দেয়া নয়। সাহিত্য প্রতিভায় তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ।

প্রমথ চৌধুরীর জন্ম যশোরে। বড় হয়েছেন তৎকালীন রাজসিক আভিজাত্যের লীলাভূমি কৃষ্ণনগরে। ছেলেবেলায় তিনি 'নানা জাতের নিম্নবর্ণের মানুষ' আর 'আধা-ভদ্রলোকদের' সংস্পর্শে এসে শিখতে পেরেছিলেন ভিন্নধর্মী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা। উদার ও সংস্কারমুক্ত মানুষ ছিলেন বলেই তাঁর মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামী ছিলো না, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিলো না। বাবার সংগৃহীত বিশাল গ্রন্থভাণ্ডারের আনুকূল্যে ছেলেবেলা থেকেই তিনি পরিচিত হয়েছেন দেশ-বিদেশের ইতিহাস, স্কটের উপন্যাস, শেক্সপিয়র-মিল্টন-বায়রনের রচনার সঙ্গে। ছাত্র হিসেবেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে রওনা হন বিলেতে। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরেও আইন ব্যবসায় তাঁর মন বসলো না। কলকাতার শৌখিন বড়লোকদের বড়মানুষী চালচলন দেখে বেড়াতে তাঁর ভাল লাগলো : 'রাজা মহারাজাদের সঙ্গলাভ, গার্ডেন পার্টিতে যাতায়াত, ব্র্যাণ্ডি আর শ্যাম্পেনের অভ্যাস চললো কিছুদিন। উঁচু সমাজের বিলাসী আবহাওয়ায় দিন কাটতে লাগলো বটে, তবুও প্রমথ চৌধুরীর চোখ দেখতে ভুল করল না লক্ষ্ণৌয়ের মনোহারিণী বাইজিকে, দার্জিলিঙ-এ সাক্ষাৎ পাওয়া সুন্দরী ফিঙ্গকে; মন গ্রহণ করতে ভুল করল না সিমলার কাঞ্চী নামীয় গাইয়েদের।'[২] এভাবে ক্রমেই তিনি একজন মজলিশি মানুষ হয়ে উঠলেন– গড়ে উঠল তাঁর 'কমলালয়ে' সাহিত্য-মজলিশ। সেখানে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস,

---

* সহকারী অধ্যাপক, সরকারী সঙ্গীত কলেজ, ঢাকা

প্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি সব কিছুরই আলোচনা হতো। আর আলোচনার লক্ষ্য ছিল মনকে আনন্দ দেয়া– মনকে ভারাক্রান্ত করা নয় এবং সবকিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে গ্রাহ্য করা। সেসব আলোচনার ধরনটা হাল্‌কা হলেও বিষয় মোটেও হালকা ছিল না। এভাবেই ভাব, চিন্তা ও সাহিত্যের সমন্বয়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রমথ চৌধুরীর মানসজগৎ গড়ে উঠেছিল। প্রমথ চৌধুরীর এই আভিজাত্যপূর্ণ জীবনবোধের কারণে তাঁর ছোটগল্প বাঙালি মধ্যবিত্তের সচেতন হৃদয়চর্চা থেকে নতুন প্রান্তরে সরে এসেছে। তাই তাঁর গল্পের উপকরণে ও রচনারীতিতে এসেছে বৈচিত্র্য। তাঁর বিষয়বোধ, মননধর্ম ও বিশিষ্ট রচনারীতির কারণে প্রবন্ধ ও কবিতার পাশাপাশি তিনি ছোটগল্প রচনার ক্ষেত্রেও হয়েছেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে জ্যোতির্ময়। তাঁর প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ, মেধাক্ষুরধার এবং দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। তাই তাঁর লেখনী অনায়াসে বিচরণ করেছে সমাজের সর্বত্র— গল্পের পরিধি বিস্তৃত হয়েছে মধ্যবিত্ত জীবন থেকে অভিজাত সমাজের শীর্ষ পর্যন্ত। গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে, ধর্ম-সংস্কারমুক্ত উদার জীবনবোধ আর নীতি-শাসনমুক্ত বেপরোয়া যৌবনের স্বীকৃতি।

'সবুজপত্র' (১৯১৪) প্রকাশের পূর্বে প্রমথ চৌধুরী একটি মৌলিক গল্প ও একটি ফরাসি গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ফরাসি ছোটগল্পের উদ্‌গাতা প্রসপার মৌরমের 'Etruscan Vax' গল্পটিকে 'ফুলদানী' নামে তিনি অনুবাদ করেন। গল্পটি বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা অনুচিত বলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করার পরও সংস্কারমুক্ত দৃষ্টির কারণে এ-জাতীয় গল্প অনুবাদে তিনি ক্ষান্ত হননি। এরপর তিনি অনুবাদ করেছিলেন মেরিমের 'কার্মেন'; গল্পটির বিষয়বস্তু 'ফুলদানি'র চেয়েও বেশি অসামাজিক। এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার পূর্ণোদ্যমে গল্পরচনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের গল্প বাংলা ছোটগল্পের আদর্শ। আর প্রভাতকুমার একজন জনপ্রিয় গল্পকার হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের অব্যাহত প্রভাবের যুগেও প্রমথ চৌধুরীর গল্পে লক্ষ করা যায় বিস্ময়কর মৌলিকত্ব।

'প্রমথ চৌধুরীর ছোটগল্প নাটকীয়, চূড়ান্ত মুহূর্তগুলি খরদীপ্ত, কাহিনী দ্রুত তালমণ্ডিত। গল্পগুলি বিতর্কবহুল, অনেক সময় প্রারম্ভ ও পরিণতি দুইই বিতর্ককণ্টকিত— এই তর্ক-বিতর্কের অমসৃণ উপলখণ্ডগুলি গল্পাংশের সহজ ও স্বচ্ছন্দ প্রবাহকে বাধা দিয়েছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, যেন তাঁর গল্পরসের দিকে মোটেই নজর নেই– তাই বিচার-বিতর্কের মন্তব্য-তীক্ষ্ণ অসিফলকের আঘাতে সদ্যোরচিত গল্পের স্ফটিক পাত্রটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।'[৩] এই প্রেক্ষাপটেই আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রমথ চৌধুরীর গল্প-সংকলন *আহুতি* (১৯১৯) গ্রন্থে সংকলিত গল্পগ্রন্থগুলোর বিষয়স্বাতন্ত্র্য ও শিল্পবৈশিষ্ট্যের স্বরূপ অন্বেষা।

ছয়টি ভিন্নস্বাদের গল্প—'আহুতি', 'বড়বাবুর বড়োদিন,' 'একটি সাদা গল্প', 'ফরমায়েশি গল্প', 'ছোটোগল্প' এবং 'রাম ও শ্যাম'-এর সমন্বয়ে রচিত হয়েছে 'আহুতি'। গ্রন্থ-অন্তর্গত গল্পসমূহে লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতা এবং অভিজাত মনের সমাবেশ ঘটেছে। গল্পগুলোর চরিত্র ও পটভূমিকার মধ্যেও রয়েছে বৈচিত্র্য। প্রেম-ভালবাসা এবং জীবনের প্রাত্যহিক সমস্যা গল্পগুলোতে অনুপস্থিত। এর পরিবর্তে এসেছে রঙ্গিণীর মত ঈর্ষাপরায়ণ নারী ('আহুতি'), পুত্রহারা রত্নময়ীর অদ্ভুত প্রহিতিংসাপরায়ণতা ('আহুতি'), বিশুদ্ধ চরিত্রের বড়বাবুর সন্দেহ-প্রবণতার চরম পরিণাম ('বড়ো বাবুর বড়োদিন'), বাপের বয়সী গ্রামপতির সঙ্গে শ্রীমতির বিয়ের বাসরে তার নিষ্প্রাণ মুখের নিরাবেগ উপস্থাপনা' ('একটি সাদা গল্প'), মজলিশি ঘোষালের নৈতিক বিচারে আড়ষ্ট হাস্যকর প্রেমকাহিনী রচনা ('ফরমায়েশি গল্প'), প্রফেসরের জীবনবৃত্তান্তের মধ্য দিয়ে জীবনের নবদিগন্ত উন্মোচন ('ছোটোগল্প') এবং ভারতীয় রাজনীতির চিরন্তন ভ্রাতৃঘাতী সর্বনাশা দলাদলির মর্মান্তিক ইতিহাস ('রাম ও শ্যাম') প্রভৃতি বিষয়।

আহুতি-এর প্রথম গল্প 'আহুতি'। এই-গল্পের পটভূমি রচিত হয়েছে এককালের দুর্দান্ত জমিদার রায়বাবুদের দ্বারা শাসিত রুদ্রপুরের ধ্বংসাবশেষের উপর। রুদ্রপুরের জমিদাররা মানুষের প্রতি যেমন অবিচার করতো, তেমনি দয়াও দেখাতো। এরা চলতো নিজের খেয়ালে; কেননা নবাবের আমলে এদের কোন শাসনকর্তা ছিল না। ফলে এদের মনে জন্ম নিয়েছিল 'জাতির অহংকার, ধনের অহংকার, বলের অহংকার এবং রূপের অহংকার।'[৪] এ কারণে এরা মানুষকে মানুষই মনে করত না। কিন্তু 'অহংকারে পতন আসে'– কর্মফলের এই অবশ্যম্ভাবী বাণী একদিন তাদের উপর নিপতিত হলো। এদেশে ইংরেজ আসার পূর্বেই এ পরিবারে ফাটল ধরল। কোম্পানির আমলে হলো সর্বনাশ। খাজনার দায়ে অধিকাংশ সম্পত্তি হাত-ছাড়া হলো– লোপ পেল রায়বংশ। বাকি সম্পত্তি ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হলো– যে রায়বংশে মুহুরির কাজ, জেলার কাছারিতে মোক্তার ও নানা ফন্দি-ফিকিরের মাধ্যমে এবং সুদের ব্যবসায় হু হু করে টাকা বাড়িয়ে ইতোমধ্যেই লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক হয়েছে। রায়বংশের শেষ উত্তরাধিকার দুর্ধর্ষ ও অসমসাহসী পুরুষ উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর ধনঞ্জয় রুদ্রপুরে রায়বাবুদের পৈতৃক ভিটা দখল করলেও উগ্রনারায়ণের একমাত্র বিধবা কন্যা রত্নময়ীকে সেই বাড়ি থেকে বের করে দেয়ার কোন চেষ্টা করেনি। কারণ রুদ্রপুর সংলগ্ন পাঠানপাড়ার লাঠিয়াল প্রজারা রত্নময়ীকে পাহারা দিত। ধনঞ্জয়ের সাথে বাস করত তার একমাত্র কন্যা রঙ্গিণী দাসী এবং রঙ্গিণীর স্বামী রতিলাল দে। সারাজীবনের উপার্জিত ধন চিরদিন রক্ষার মানসে অশিক্ষিত, বর্বর, সেকেলে শূদ্র

বুদ্ধিজাত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস আচ্ছন্ন ধনঞ্জয় একটি ব্রাহ্মণ শিশুকে যখ্ দেওয়ার পরিকল্পনা করতে থাকে। একথা শুনে রঙ্গিণী আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে। ফলে ধনঞ্জয়ের মনস্কামনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। কেননা, 'ধনঞ্জয় এ পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছু যদি ভালোবাসতেন তো সে হচ্ছে তাঁর কন্যা। চুনসুরখির গাঁথনির ভিতর এক একটি গাছ যেমন শিকড় গাড়ে, ধনঞ্জয়ের কঠিন হৃদয়ের কোনো একটি ফাটলের ভিতর এই কন্যাবাৎসল্য তেমনিভাবে শিকড় গেড়েছিল।'[৫] ধনঞ্জয়ের মত বর্বর, কঠিন প্রকৃতির একজন মানুষের মনে সন্তান-বাৎসল্যের এই অপরূপ মহিমা মানব প্রকৃতি সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর সূক্ষ্ম চিন্তাধারারই বহিঃপ্রকাশ।

'আহুতি' গল্পে রঙ্গিণীর মধ্যে একদিকে যেমন দেখা যায় স্নেহময়ী মাতৃরূপ, অন্যদিকে নিষ্ঠুরতা, ঈর্ষা আর সন্দেহপরায়ণতার সমন্বয়ে এক পৈশাচিক নারীমূর্তি। ব্রাহ্মণ শিশু যখ্ দেওয়ার প্রসঙ্গে রঙ্গিণী একদিন আহার-নিদ্রা ত্যাগ করেছিল, অথচ ঈর্ষা, সন্দেহ এবং প্রতিশোধস্পৃহায় জর্জরিত হয়ে তার মজ্জাজাত হিংসাপ্রকৃতি চরিতার্থের জন্য রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ্ দেওয়ার জন্য সে নিজেই সংকল্পবদ্ধ হলো। কেননা রত্নময়ীর তিন বছরের ছেলে কিরীটচন্দ্রের প্রতি স্নেহের আকর্ষণে নিঃসন্তান রতিলাল প্রতিদিন রত্নময়ীর বাড়িতে যেত– যদিও রত্নময়ীর সঙ্গে কখনও তার দেখা হয়নি। কিন্তু রঙ্গিণীর মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়েছিল যে, রত্নময়ী তার স্বামীকে সুপুরুষ দেখে ছিনিয়ে নিতে চায়। স্বামীর প্রতি রঙ্গিণীর ছিল প্রচণ্ড ভালোবাসা– যদিও 'এ ভালোবাসা একটি প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যতীত তার কিছুই নয়, এবং সে ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধার মতোই অন্ধ ও নির্মম।'[৬] এছাড়াও রঙ্গিণীর মনে রত্নময়ীর প্রতি ঈর্ষা জন্মেছিল আর একটি কারণে, তা হলো রত্নময়ীর রূপ। 'রঙ্গিণী জানালার ফাঁক দিয়ে রত্নময়ীকে নিত্য দেখত এবং তার সকল মন, সকল দেহ হিংসার বিষে জর্জরিত হয়ে উঠত– যেহেতু রঙ্গিণীর আর যাই থাক্ রূপ ছিল না। আর তার রূপের অভাব তার মনকে অতিশয় ব্যথা দিত, কেননা তার স্বামী রতিলাল ছিল অতি সুপুরুষ।'[৭] তাই রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ্ দিয়ে সে তার পাশবিকতা চরিতার্থ করে। মাতৃত্বের অচরিতার্থতা, জৈবিক ভালবাসা, কামনা-বাসনা-ঈর্ষাপরায়ণতা এবং প্রতিশোধ-স্পৃহার আগুনে ঝলসে ওঠা রঙ্গিণী প্রমথ চৌধুরীর এক অসাধারণ সৃষ্টি।

রত্নময়ী 'আহুতি' গল্পের প্রধান চরিত্র যার রূপ, অহংকার এবং ঐশ্বর্যের বিশাল ভাণ্ডারের সূক্ষ্ম পথে এসেছে গল্পের ভয়াবহ পরিণাম। বিশ/একুশ বছরের অপূর্ব সুন্দরী এই নারীর চোখ দুটো ছিল সর্বদা স্থির ও নিশ্চল। সে-চোখে সর্বদা

ফুটে উঠত চারপাশের নর-নারীর উপর অগাধ অবজ্ঞা। কেননা 'রত্নময়ী তাঁর পূর্বপুরুষদের তিনশত বৎসরের সঞ্চিত অহংকার উত্তরাধিকারীস্বত্বে লাভ করেছিলেন। বলাবাহুল্য, রত্নময়ীর অন্তরে তাঁর রূপেরও অসাধারণ অহংকার ছিল। কেননা 'তাঁর কাছে রূপ ছিল তাঁর আভিজাত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। রত্নময়ীর মতে রূপের উদ্দেশ্য মানুষকে আকর্ষণ করা নয়– তিরস্কার করা।'[৮] এই রত্নময়ী যখন তার ছেলের নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনল, তখন তার অভিব্যক্তিতে যে প্রতিক্রিয়া ফুটে উঠেছিল তাও যেন তার অহংকারী আভিজাত্যেরই নিদর্শন– 'আজ তিন বৎসরের মধ্যে রত্নময়ীর মুখে কেউ হাসি দেখেনি। তার ছেলের এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, দেখতে দেখতে মনে হল সে হেসে উঠলো।'[৯] সন্তান হারানোর বেদনায় উন্মত্ত রত্নময়ী মেতে উঠলো প্রতিশোধের দুর্নিবার নেশায়। 'সেই দিন দুপুর রাত্তিরে যখন সকলে শুতে গিয়েছে— রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিল। সকল শরিকের বাড়ি সব গায়ে গায়ে। তাই ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে সে-আগুন ব্যাপ্ত হয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়িও গ্রাস করলো। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করেছিল, সদর ফটকে এসে দেখে রত্নময়ীকে ঘিরে পাঠানপাড়ার প্রায় একশো প্রজা ঢাল-সড়কি ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রত্নময়ীর আদেশে তারা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীকে সড়কির পর সড়কির ঘায়ে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলে দিল। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে উঠল।'[১০] অবশেষে সব পুড়ে ছাড়খার হয়ে গেলে রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করে।

রুদ্রপুরের এই হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে রত্নময়ীর পুত্র-হারানোর শোক আমাদের যতটা বেদনাহত করে, তার চেয়ে বেশি স্তম্ভিত করে তার অদ্ভুত প্রতিহিংসা সাধনের ভয়াবহতা। কারুণ্য ও ভয়াবহতার প্রেক্ষাপটে রত্নময়ীর এই ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য বাংলা সাহিত্যে বিরল।

'বড়োবাবুর বড়োদিন' গল্পে বড়বাবুর জীবন যান্ত্রিক, বৈচিত্র্যহীন ছকে বাঁধা নিয়মতান্ত্রিক হলেও পরমাসুন্দরী স্ত্রী পাটেশ্বরীর কারণে তা মোটেও নিরানন্দ ছিল না। কিন্তু অনেক সময় মানুষের অধিক সুখের কারণই তার নিতান্ত অসুখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর তাই সুন্দরী স্ত্রীকে হারাবার ভয় বড়বাবুর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে অশান্তি আর দুর্ভাবনায় ছেয়ে ফেলেছিল। সন্দেহবাতিকগ্রস্ত বড়বাবু স্ত্রীজাতি—বিশেষ করে রূপবতী স্ত্রীর প্রতি কিছুতেই আস্থা রাখতে পারতেন না। তাঁর এই স্বভাবত দুর্বলতার কারণেই তিনি শেষপর্যন্ত জীবনকে উপভোগ করতে ব্যর্থ হন।

ঘটনাক্রমে একদিন থিয়েটার থেকে ফেরার পথে জুড়ি গাড়ির মধ্যে নিজের স্ত্রী সন্দেহে অন্য একজন মহিলাকে দেখতে যাওয়ার অপরাধে পাহারাদারের হাতে তিনি ধরা পড়েন এবং বিপদ থেকে বাঁচার জন্য মাতালের অভিনয় শুরু করেন, কিন্তু তিনি শেষরক্ষা করতে পারেননি। অত্যন্ত নীতিবাগীশ, বিশুদ্ধ চরিত্রের বড়বাবু সমাজে চিহ্নিত হয়েছেন চরিত্রহীন মাতালরূপে– চিরদিনের জন্য বঞ্চিত হয়েছেন স্ত্রীর ভালবাসা থেকে। সচ্চরিত্র বড়বাবুর ভাগ্যের এই নির্মম পরিহাস সম্পর্কে শেষে লেখকও ঠাট্টা করে বলেছেন, 'এ গল্পের moral এই যে, পৃথিবীতে ভালো লোকেরই যত মন্দ হয়– এই হচ্ছে ভগবানের বিচার।'[১১] বড়বাবুর এই করুণ পরিণাম হাস্যকর হলেও, তা আমাদের মনে সমবেদনা জাগায়। কেননা, 'তিনি যে কোনো দোষে দোষী নন, এবং তাঁর নির্মল চরিত্র যে কোনোরূপ কলঙ্ক ধরেনি– এই সত্য কথাটাও তিনি মুখ ফুটে বলতে পারলেন না। তিনি বুঝলেন যে, আসল ঘটনাটি যে কী, ইহজীবনে তিনি তা জানাতে পারবেন না– মধ্যে থেকে তিনি শুধু চিরজীবনের জন্য মিছা অপরাধী হয়ে থাকলেন'[১২] বড়বাবুর জীবনের ট্র্যাজেডি এখানেই। বিশুদ্ধ সামাজিক স্যাটায়ার এবং নীতিবাগীশদের পিঠে চাবুক মারা লেখকের আসল উদ্দেশ্য হলেও, মানবিক দিক থেকে চরিত্রটির চিত্রায়ণে লেখকের সাফল্য কোনও অংশে কম নয়।

'একটি সাদা গল্পে' শ্যামলালের ষোড়শী, শিক্ষিতা–অসাধারণ রূপবতী কন্যা শ্রীমতীর সঙ্গে বাবার বয়সী দোজবর ক্ষেত্রপতির বিয়ের নামে যে অভিনয় চিত্রিত হয়েছে, তা মর্মস্পর্শী। সুশিক্ষিত, ভদ্র এবং উদার মনের শ্যামলাল তাঁর মাতৃহারা কন্যা শ্রীমতীকে গড়ে তুলেছিলেন আপন আদর্শ এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির আলোকে। 'তিনি তাঁর সকল অবসর এই কন্যার শিক্ষায় নিয়োগ করলেন। তাঁর যত্নে, তাঁর শিক্ষায়, তাঁর মেয়ের মন– ফুল যেমন উপরের দিকে আলোর দিকে মাথা তুলে ফুটে ওঠে, সেই রকম ফুটে উঠতে লাগল। লোকালয়ের বাইরে থাকায় তার চরিত্রও ফুলের মতো শুভ্র এবং ফুলের মতোই নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠেছিল।'[১৩] কিন্তু শ্যামলাল আদৌ ভাবতে পারেননি, মেয়ের এই সুশিক্ষা এবং ফুলের মতো বেড়ে ওঠাই একদিন কাল হয়ে দাঁড়াবে। এই শ্রীমতী যেন রবীন্দ্রনাথের হৈমন্তী চরিত্রের আর এক সংস্করণ। দুটি চরিত্রই সামাজিক অপ-সংস্কার এবং মিথ্যে বিধি-নিষেধের নির্মম শিকার। দুজনের জীবনের করুণ পরিণতির মূলেই আছে বাবার দেওয়া উদার নৈতিক চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-দীক্ষা এবং লোকসমাজের অন্তরালে সংস্কারমুক্ত পরিবেশে বেড়ে ওঠা।

শ্যামলালের বিশ্বাস ছিল, যেকোন সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র যুবক শ্রীমতীকে বিয়ে করতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করবে। কিন্তু সমাজ থেকে দূরে– আলাদা থাকার কারণে তিনি সমাজের কথাটা একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। তাই মেয়ের বয়স ষোল হলেও তাকে বিয়ে দেবার কোন উদ্যোগ তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু বহুদিন পর মেয়েকে নিয়ে তিনি যখন নিজগ্রামে ফিরে এলেন তখন মুখোমুখী হলেন চরম অশান্তির। আত্মীয়স্বজনরা ছি ছি করতে লাগল; কেননা, এতবড় মেয়ের বিয়ে হয়নি, তার উপর আবার পুরুষের মতো লেখাপড়া জানে। শ্যামলাল লোকনিন্দায় অতিষ্ঠ হয়ে যতশীঘ্র সম্ভব মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোন পাস-করা যুবক শ্রীমতীর মত ষোড়শী রূপবতী, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বরপণে অসমর্থ বাবার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হলো না। ফলে পারিবারিক অশান্তি বেড়েই চলল–শান্ত রইল কেবল শ্রীমতী। কোন লাঞ্ছনা-গঞ্জনা-নিন্দা তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করেনি। কারণ, 'তার মনের উপর যে বরফ পড়েছিল তা এতদিনে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল। নিন্দাবাদ প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিষের ক্ষুদ্র কষ্ট সে-মনকে স্পর্শ করতে পারত না। তবে এই স্থির আত্মপ্রতিষ্ঠা ভাবকে গ্রামের লোক অহংকার বলে ধরে নিলে। এর ফলে শ্রীমতীর বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষ এতটা বেড়ে গেল যে, শ্যামলাল তা আর সহ্য করতে না পেরে মেয়েকে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।'[১৪] কিন্তু শ্যামলালের খুড়োমহাশয় তা করতে দিলেন না। তিনি দক্ষিণপাড়ার ক্ষেত্রপতি মুখুজ্যের সঙ্গে শ্রীমতীর বিয়ে ঠিক করলেন– যার বয়স পঁয়তাল্লিশ, অকাটমূর্খ; তিনদিন হলো তার স্ত্রী মারা গেছে এবং দেহে বল, মনে সাহস ও ঘরে প্রচুর টাকা আছে। ক্ষেত্রপতি এ বিয়েতে আগ্রহের কারণ, 'শ্রীমতী সুন্দরী এবং কিশোরী। সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করবার লোভ ক্ষেত্রপতি জীবনে কখনো সংবরণ করতে পারেননি; এবং এক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া শ্রীমতীকে আত্মসাৎ করার উপায়ান্তর নেই জেনে তিনি তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হলেন।'[১৫] শ্যামলাল এ বিয়েতে ঘোর আপত্তি তুললেও শ্রীমতী বলল, এ বিয়ে সে করবেই। 'সে বুঝেছিল যে, তার বিবাহ না হওয়াতক তার বাপের বিড়ম্বনার আর শেষ হবে না। তাছাড়া সে কোনো দুঃখ কষ্টকেই আর ভয় করত না, বরং তার মনে হত যে তার পক্ষে জীবনে নিজে সুখী হবার ইচ্ছাটাও একটা মহাপাপ, সে ইচ্ছাটা যেন তার নির্মম স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়।'[১৬] তাই ক্ষেত্রপতির সাথেই তার বিয়ে ঠিক হলো। বিয়ের আসরে শ্রীমতীকে দেখে মনে হলো যেন, 'সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়— শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্তি; তার সকল অঙ্গ দেবতার মতোই প্রশান্ত আর নির্বিকার।'[১৭]

সুন্দরী, শিক্ষিতা, অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্না এবং ধীর স্থির অবিচল ও সহানুভূতিশীল মনের শ্রীমতীর জীবনের এই ট্র্যাজিক পরিণতি চিত্রায়ণে প্রমথ চৌধুরী যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, গভীর সহানুভূতি এবং সহজ শান্ত নিরাবেগ উপস্থাপন–রীতিতে অনন্য।

'ছোটগল্প' আর একটি গল্প– যার moral সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য, 'জীবনটা ট্র্যাজেডি নয়, কমেডিও নয়, কারণ সংসারটা হচ্ছে একসঙ্গে ও দুই-ই।'[১৮] এই মন্তব্যের আলোকেই এ গল্পের কথক প্রফেসর কিশোরীরঞ্জনের জীবনে পরস্ত্রী কিশোরীকে নিয়ে রচিত হয়েছে ট্র্যাজি-কমেডির এক বিচিত্র সংমিশ্রণ।

প্যাসেঞ্জার-ট্রেনে উত্তরাভিমুখে যাত্রার পথে প্রফেসরের সঙ্গে পরিচয় হয় দে-সাহেব আর তার দু'সঙ্গী অপরূপা কিশোরী ও স্থূলাঙ্গী শ্রীমতীর। প্রথম দর্শনেই কিশোরীর প্রেমে পড়েন প্রফেসর। কিন্তু দে-সাহেবের সম্মতিক্রমে বাবাকে নিয়ে যখন মেয়ে দেখতে এলেন, তখন স্তম্ভিত হলেন সব জেনে। কারণ, যে মেয়েটিকে দেখানো হয়েছে সে দে-সাহেবের অবিবাহিতা কন্যা শ্রীমতী, কিন্তু যার প্রেমে পড়েছেন সে হলো দে-সাহেবের দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহিতা স্ত্রী কিশোরী– যাকে দে সাহেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা বলে ভুল করেছিলেন প্রফেসর। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আঘাত পেয়ে এ বিয়েতে অসম্মতি জানান এবং বিয়ে ভেঙ্গে যায়। কিশোরীকে না-পাওয়ার বেদনা প্রফেসরের জীবনে ট্র্যাজিক আবহ সৃষ্টি করলেও, লেখক গল্পের মোড় ঘুরিয়েছেন অন্যভাবে, কেননা জীবনের সংজ্ঞার্থ তাঁর কাছে অন্যরকম।

বহুদিন পর কিশোরী যখন বিধবা এবং কপর্দক শূন্য অবস্থায় প্রফেসরকে চিঠি লিখেছেন তখন অনায়াসে তিনি কিশোরীর ছোট্ট মেয়েসহ পুরো পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আর্থিকভাবে। কিন্তু কিশোরীর আগ্রহ সত্ত্বেও কখনো তার সঙ্গে দেখা করেননি। গল্পের শেষে প্রফেসরের ট্র্যাজিক পরিণতিকে লেখক পুরোপুরি উপেক্ষা করে সচেতনভাবে প্রেমের মোহাবরণ ছিন্ন করার চেষ্টা করেছেন। 'তার অর্থ এই নয় যে, তাতে লেখকের প্রাথমিক সহানুভূতিটুকু পর্যন্ত নেই। আমাদের অধিকাংশ সাহিত্যে যে হৃদয়বোধের প্রয়োগেও অসংযম ও মাত্রাতিরেক দেখা যায়। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর গল্পে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহানুভূতি আছে, আছে হৃদয়বোধের প্রকাশ— কিন্তু তার প্রয়োগ সর্বত্রই শুদ্ধ ও সংযত– বুদ্ধির দ্বারা তাকে শোধন করে পরিমিত পরিমাণে প্রয়োগ করাই তাঁর ধর্ম।'[১৯]

'রাম ও শ্যাম' গল্পে রাম ও শ্যাম নামের যমজ দু'ভাইয়ের চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী ভারতীয় রাজনীতির যে চিরন্তন দুর্দশা ও ধ্বংসাত্মক দিকগুলো তুলে ধরেছেন, তা তাঁর বিদগ্ধ চিন্তা-চেতনারই রূপায়ণ। 'স্বরাজের নামে আমরা যে দলাদলি করি, লেখক অতি দুঃখে সেই কথাটাই রাম ও শ্যামের ছবি এঁকে দেখিয়েছেন,... জয়চাঁদ–পৃথ্বিরাজ থেকে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ-হিন্দু মহাসভা পর্যন্ত ভ্রাতৃঘাতী সর্বনাশা দলাদলির মর্মান্তিক ইতিহাস এই গল্পের দর্পণে প্রতিবিম্বিত। ১৯১৭-১৮ সালের গল্প ১৯৪৭-৪৮ সালের দেশ বিভাগের রক্তাক্ত পটভূমেও সমান প্রযোজ্য।'[২০] রাম ও শ্যাম চরিত্র চিত্রণে প্রমথ চৌধুরীর সার্থকতা এখানেই।

'ফরমায়েশি গল্পে' গল্প-কথক ঘোষালের গল্প বলার মধ্য দিয়ে লেখক এক অবিশ্বাস্য হাস্যকর গল্পের উপস্থাপন করেছেন। বাংলা রোমান্স–কাহিনীর অসম্ভাব্য দিকগুলো লেখক এ গল্পে উপস্থাপন করেছেন বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে। মকদমপুরের জমিদার রায়মশায়ের ইয়ার-বক্সি সমন্বিত বৈঠকখানায় শ্রাবণ-মুখর সান্ধ্য-আসরে চাটুকার ঘোষাল রায়মশায়ের ফরমায়েশ অনুসারে মধুর রসের গল্প বলতে শুরু করে। কিন্তু রায়মশায় আর তার ইয়ার বন্ধুদের বিচিত্র দাবি অনুযায়ী ঘোষাল যে গল্পটি উপস্থাপন করে তা অত্যন্ত হাস্যকর। গল্পের মধ্যে ঘোষাল এনেছে আমাদের সামাজিক সংকীর্ণতা এবং অন্ধ সংস্কারের পেষণে জীবনের স্বাভাবিক প্রবাহ ব্যাহত হওয়ার অস্বাভাবিক চিত্র। আর এসব নীতিশাস্ত্রের মান বাঁচাতে গল্প উপন্যাসের যে দৈন্য-দশা উপস্থিত হয়, ঘোষালের গল্প বলার মধ্য দিয়ে প্রমথ চৌধুরী তা সার্থকভাবে উপস্থাপন করেছেন 'ফরমায়েশি গল্পে'।

যে লেখার ভেতর মানুষের মনের কিংবা চরিত্রের সামান্যতম পরিচয় পাওয়া যায়, তাই যদি গল্প বলে গ্রাহ্য হতে পারে, তবে প্রমথ চৌধুরীর গল্পে তার কোন অভাব ঘটেনি, বরং তার প্রাচুর্যই রয়েছে। প্রতিটি গল্পের মধ্যে যেমন আছে বিশুদ্ধ গল্পরস, তেমনি জীবনের বিচিত্র রহস্য প্রভাবিত বাংলা ছোটগল্পের যুগেও সৃষ্টি হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের স্বতন্ত্র এক ভুবন। 'আহুতি' গল্পগ্রন্থ তারই সার্থক দৃষ্টান্ত।

তথ্যসঙ্কেত

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোট গল্পের নব্বই বছর* (কলকাতা : ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৯৮২, পৃ. ১৯৫

২। জীবেন্দ্র সিংহরায়, *প্রমথ চৌধুরী* (কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫ সং), পৃ. ৬

৩। রবীন্দ্রনাথ রায়, *ছোটগল্পে কথা* (কলকাতা : পুস্তক বিপণি, ১৯৮৮ সং) পৃ. ৯৬

৪। প্রমথ চৌধুরী *গল্পসংগ্রহ* (কলকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৯৪

৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১, ১০২

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৬

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

১৯। জীবেন্দ্র সিংহরায়, *প্রমথ চৌধুরী,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩

২০। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *কালের পুত্তলিকা : বাংলা ছোটগল্পের নব্বই বছর,* পূর্বোক্ত, পৃ. ২০২-২০৩